ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখ ঃ একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা সংসদের অন্তর্গত দর্শনশাস্ত্রে পিএইচ.ডি
উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণাপত্র

বর্ষ - ২০২২

ইন্দ্রাণী সেন

দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

সংক্ষিপ্তসার

''সুখতরে সবাই কাতর, কে বা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা?

সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা।।''- স্বামী বিবেকানন্দ

জীবমাত্রই সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। অবিদ্যা বা মায়াগ্রস্ত বদ্ধ জীব সর্বদা সুখের জন্য লালায়িত এবং তাদের সব কর্মের সম্পাদন বা যাবৎ কর্মে প্রবৃত্তি এই সুখের কথা ভেবেই। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে জল ভেবে পথিক যেমন সেই পথে ধাবিত হয়, তেমনি মানুষ যেখানেই সুখের বিন্দুমাত্র সন্ধান পায়, সেখানেই সুখান্বেষণে ছুটে চলে। ''এই সুখের জন্য দাতা দান করেন, গ্রহীতা হাত পাতে; সুখের জন্যই রাজা রাজমুকুট মাথায় পরেন, অপরদিকে একটু সুখের আশায় কাঙালিনী ভিখারী তৃণগুচ্ছ ও পাতার দ্বারা কুটির বাঁধে। সুখের দুর্নিবার আকর্ষণে কেউ গঞ্জিকা সেবন করে, কেউ বা রঙিন দ্রব পদার্থকে সুরাপাত্রে ঢালতে ঢালতে সুখে বিভোর হয়ে পড়ে। এই সুখের জন্যই চোর চুরি করে, কেউ বা ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে।''[১] কিন্তু জীব সুখের কাঙ্গাল হলেও সুখমাত্রই দুঃখ সম্পৃক্ত। সংসার সুখ ও দুঃখময়। মানুষের জীবনে সুখের মধ্যেও দুঃখ আছে। দুঃখ সর্ব জীবের অনুভবসিদ্ধ পদার্থ। দুঃখ আমাদের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় এর অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবেই প্রমাণিত হয়। জগতে এমন জীবের সন্ধান পাওয়া দুর্লভ যার কখনও কোন দুঃখের অনুভূতি হয়নি। দুঃখের অস্তিত্বকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

[১] নীল আকাশের নীচে, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০২১, পৃ - ১৬১।

ন্যায়দর্শনে দুঃখকে 'প্রতিকূলবেদনীয়' বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে বেদনা বা অনুভূতি আমাদের প্রতিকূল, তাই হল দুঃখ। অন্য ভাষায় বলা যায় যে, যা অনুভূত হওয়ামাত্র আমরা বুঝি যে সেটা আমরা চাই না, সেই অনুভূতিই হল দুঃখ। প্রতিকূলবেদনীয় হওয়ায় দুঃখকে আমরা কেউই সচেতনভাবে কামনা করি না। কারণ দুঃখ হ'ল বেদনাস্বরূপ।

জগতে যে দুঃখ আছে, অর্থাৎ জগত দুঃখময় - এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন; কারণ তা জীবমাত্রের প্রত্যক্ষবেদ্য। তবে, ভারতীয় দার্শনিকগণ জীবের দুঃখ আছে - একথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তাঁরা এই দুঃখজয়ের পথ নির্দেশ করেছেন। বস্তুতঃ দুঃখ আছে বলেই তা নিবৃত্তির প্রশ্ন ওঠে। দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং সেই দুঃখনিবৃত্তির উপায়ের অনুসন্ধান করেছেন ভারতীয় দার্শনিক। ক্ষুধা, তৃষ্ণাজন্য যে দুঃখ, তা খাদ্যগ্রহণ, জলপানের মাধ্যমে যেমন নিবৃত্ত হয়, তেমনি যাবৎ দুঃখ-নিবৃত্তিও অসম্ভব নয়।

দুঃখের অভিঘাতের ফলেই জীবের দুঃখ থেকে মুক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়ে থাকে। আমরা আমদের দৈনন্দিন জীবনে দেখি যে, আমাদের শরীর খারাপ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই; মানসিক কোন সমস্যা হলে বা মন খারাপ হলে মনোবিজ্ঞানী বা মনোসমীক্ষকের দ্বারস্থ হই; আবার, হর্ষ দ্বারা শোকের উপশম করি। এগুলি সবই লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তির উদাহরণ। এই উপায়ে দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয় বটে, তবে তা পুনরায় ফিরে আসে। দুঃখের পুনরায় আগমনের ফলে দুঃখের নিবৃত্তি সামগ্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ জীব একটি দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেলেও অন্য এক বা একাধিক দুঃখ তার পশ্চাদ্ধাবন করে; অথবা সেই দুঃখই কালান্তরে ফিরে আসে। তা ছাড়া, লৌকিকভাবে দুঃখনিবৃত্তির যে উপায়গুলি প্রসিদ্ধ, সেগুলি নিশ্চিতভাবে দুঃখনিবৃত্তি সবক্ষেত্রেই করতে পারবে - এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন, কোন একটি ওষুধ যা বিশেষ প্রকারের রোগ নিরাময়ের

জন্য নির্দিষ্ট, সেটি যে সব রোগীর উপর সমানভাবে কার্যকর হবে, সে কথাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সুতরাং, দুঃখনিবৃত্তির লৌকিক উপায়ের দ্বারা দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। আবার, আনুশ্রবিক উপায় বা যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমেও দুঃখের নিবৃত্তির কথা মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে। তবে, যাগাদির অনুষ্ঠানের ফলে জীবের যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, সেই স্বর্গসুখও কিন্তু চিরস্থায়ী হয় না; কারণ, অনুষ্ঠিত কর্মজন্য পুণ্য ক্ষয় হলেই স্বর্গপ্রাপ্ত জীবের জরা-মরণ সম্পৃক্ত জগতে পুনরাগমন ঘটে[২] । তা ছাড়া, যাগযজ্ঞের ফলে পশুবধাদিজন্য পাপের ফলরূপ দুঃখভোগ জীবের অনিবার্য। ফলতঃ যাগাদিও দুঃখের চিরনিবৃত্তি ঘটাতে অসমর্থ।

তা হলে প্রশ্ন হয় যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কীভাবে সম্ভব? বস্তুতঃ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করতে হলে দুঃখের মূল কারণকে সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন; কেননা, কারণের উচ্ছেদ হলেই কার্যের উচ্ছেদ সম্ভব হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছেন যে, সংসারে জন্মগ্রহণই হল দুঃখের মূল কারণ। যেহেতু আমরা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে দুঃখের অনুভব করে থাকি, সেহেতু জীবের শরীর পরিগ্রহই হল দুঃখের মূল কারণ।

এখানে কেউ বলতে পারেন যে, শরীরাবচ্ছেদে তো জীবের সুখের অনুভবও হয়ে থাকে। তবে, জীবের শরীর পরিগ্রহ বা জন্মগ্রহণ শুধুমাত্র দুঃখের নয়, তা সুখেরও কারণ; কিন্তু তবুও জ্ঞানিগণ এই সুখকে যথার্থ সুখ বলে মনে করেন না। বস্তুতঃ তাঁরা জাগতিক সুখকে দুঃখেরই প্রকার বলে মনে করেছেন।

যাই হোক, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলি পাঠ করলে আমরা জানতে পারি যে, সব দর্শনই জীবের দুঃখনাশের উপায় নির্ধারণে নিয়োজিত। সব নদীর গতিপথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সাগরে মিলিত হওয়াই সেগুলির উদ্দেশ্য; ঠিক একইরকম ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিরও মূল

[২] ''ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি''- গীতা, অধ্যায় - ৯, শ্লোক - ২১ ।

উদ্দেশ্য জীবের আত্যন্তিক দুঃখের বিনাশ, যদিও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ অর্থাৎ উপায় সব দর্শনগুলিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং, মূলে সব দর্শনের মধ্যেই সমন্বয় বর্তমান। দর্শনগুলি সংসারকে দুঃখময় বলে নির্দেশ করেছেন। এই কারণে সব দর্শন সম্প্রদায়ই জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবনের জন্য যত্নবান হয়েছেন। এই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

আসলে সংসার-বন্ধনরূপ দুঃখ আছে বলেই মুক্তির এত কদর। বস্তুতঃ দুঃখই হল মুক্তির সোপান। দুঃখ আছে বলেই আমরা অর্থাৎ মায়াগ্রস্ত জীব তা থেকে বেরোবার চেষ্টা করি। দুঃখ অনুভূত হলেই আমরা চাই কতক্ষণে দুঃখটা দূর হবে। কাজেই দুঃখের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই মুক্তির আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা পায়। যদি আমরা ন্যায়দর্শনের প্রমেয় বিভাগের দিকে দৃক্‌পাত করি, তাহলেও এই বিষয়ে একটি প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায়। দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের উদ্দেশের সময় দুঃখের অব্যবহিত পরেই অপবর্গের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, দুঃখ না থাকলে মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় না। সংসারে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আছে - একথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে যেমন পারব না, তেমনি এই দুঃখকে জয় করার, অতিক্রম করার শক্তিও আমাদের মধ্যে আছে। এই শক্তিকে আবিষ্কারের জন্যই দুঃখের প্রয়োজন। দুঃখকে জয় করতে পারলেই মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, আনন্দলোকে উত্তরণ ঘটে। সুতরাং, দুঃখই হল মুক্তির সোপান। আসলে, আমাদের মতো সাধারণ বদ্ধজীবের কাছে জগৎ-সংসার দুঃখময় - একথা সত্য হলেও জ্ঞানীর চোখে জগতে দুঃখের কণামাত্রের অস্তিত্ব নেই। স্বামীজী বলেছেন, 'জগতে দুঃখ আছে - তা আগে প্রমাণ করুন,....।' সাংসারিক সুখ আমাদের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না। অর্থ, বিদ্যা ইত্যাদি ব্যক্তিভেদে সুখের পরাকাষ্ঠা হলেও সেগুলি আমাদের জীবনে পূর্ণতা প্রদান করতে সমর্থ নয়। আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয়, ঘর্ষণের ফলে হীরে যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনি দুঃখের আগুনে পুড়ে

মানুষ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে পারে। দুঃখময় জগতে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা থাকলেও তা দূর করার শক্তিও আমাদের মধ্যে রয়েছে। আর সেই শক্তিকে আবিষ্কারের জন্যই দুঃখের প্রয়োজন। দুঃখই মানুষকে আনন্দের উৎসের সন্ধান দিতে পারে। দুঃখকে জয় করেই আনন্দলোকে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং, দুঃখই হল মুক্তির সোপান। আসলে জীবাত্মার গতি সবসময় পূর্ণতার দিকে ছোটে, তা সে মন্থর গতিতে হোক বা দ্রুত গতিতে। জীবাত্মার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে ব্রহ্ম হওয়ার মধ্যে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হওয়াই আমাদের জীবনের নিয়তি। ব্রহ্মে দুঃখের কোন যোগ নেই। পার্থিব জগতের দুঃখ-কষ্টকে জয় করে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই জীবাত্মার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়, ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটে।

এই দিক থেকে দেখলে দুঃখ সম্পর্কে নতুন আঙ্গিকে আলোচনার অবকাশ আছে। বস্তুতঃ প্রয়োজনই জীবের সকল প্রবৃত্তির প্রযোজক। আমার গবেষণামূলক নিবন্ধটির শিরোনাম হল ঃ **'ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখঃ একটি সমীক্ষা'**। এই নিবন্ধের অধ্যায় বিভাজনটি নিম্নরূপঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ ভারতীয় দর্শনে দুঃখের স্থান

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ অন্যান্য আস্তিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ব্যাবহারিক জীবনে দুঃখের গুরুত্ব

পঞ্চম অধ্যায় ঃ দুঃখই মুক্তির সোপান

প্রথম অধ্যায় ঃ ভারতীয় দর্শনে দুঃখের স্থান

জীব তার প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগের জন্যই বারবার সংসারে ফিরে আসে এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। সাংসারিক সুখ মাত্রই দুঃখ মিশ্রিত হওয়ায় প্রকৃত সুখভোগ করা

সংসারদশায় জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে, দুঃখকে জীব কোনভাবেই চায় না। আমরা সবাই চাই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে। ভারতীয় দর্শন চর্চার মধ্যেই দুঃখকে জয় করার মন্ত্র লুকিয়ে আছে। চার্বাক দর্শনে জাগতিক সুখভোগকেই পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হয়েছে। জৈন ও বৌদ্ধ - এই দু'টি নাস্তিক দর্শন মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলেছেন। জৈনদর্শনে দুঃখক্লিষ্ট সংসারী আত্মাকে জীব বলা হয়েছে। অর্থাৎ জীবমাত্রেরই দুঃখভোগ অনিবার্য। বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা ব্যতিরেকে পুরো আলোচনাই দুঃখকেন্দ্রিক। এই দর্শনের চতুর্বিধ আর্যসত্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আর্যসত্য হল দুঃখ। জন্ম থাকলেই জরা, মরণ, ব্যধি, শোক, নৈরাশ্য ইত্যাদি থাকবেই; এগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। এইসবই দুঃখ।

ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে দুঃখ অন্যতম। দুঃখকে একাদশ প্রমেয়ের স্থানে রাখা হয়েছে। কাজেই নৈয়ায়িকগণের মতে, দুঃখ নামক প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানও যে মোক্ষের সহায়ক, তা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। এই বিষয়টি থেকে একথাও পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে, দুঃখ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চয়ই মিথ্যাজ্ঞান আছে, যেকারণে দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজনীয়। সুতরাং, দুঃখ বিষয়ে আলোচনার আবকাশ আছে।

বৈশেষিক দর্শনে দুঃখকে গুণ নামক পদার্থের অন্ত ক্ত করা হয়েছে। তবে, গুণ মাত্রই কোন না কোন আশ্রয়ে থাকে। গুণ নামক পদার্থের আশ্রয় হল দ্রব্য। দুঃখ নামক গুণের আশ্রয় দ্রব্য হল আত্মা। বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার, জ্ঞান - এগুলিকে জীবাত্মার বিশেষ গুণ বলা হয়েছে। ন্যায়সূত্রেও মহর্ষি দুঃখকে আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ বলেছেন।[৩]

---

[৩] ''ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মানো লিঙ্গম্।'' - ন্যায়সূত্র১।১।১০।।

সাংখ্যদর্শনে দুঃখকে রজঃগুণের পরিণাম বলা হয়েছে। জগতের সব বস্তুতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ থাকায় জাগতিক বস্তুমাত্রই সুখ, অথবা দুঃখ অথবা মোহের জনক হয়ে থাকে।

যোগদার্শনিকগণ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি - এই পাঁচপ্রকার চিত্তবৃত্তি স্বীকার করেছেন। এগুলির মধ্যে বিপর্যয় হল মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানই যাবৎ দুঃখের মূল।

পূর্ব-মীমাংসা দর্শনে চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্মই গুরুত্ব পেয়েছে। এই দর্শনে বলা হয়েছে, বেদের বিধি অনুসরণ করাই হল ধর্ম। ধর্ম পালনের মাধ্যমে যে অদৃষ্ট শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে অপূর্ব বলা হয়েছে। ধর্মের সম্পাদনের ফলে উৎপন্ন এই অপূর্বই জীবের সুখের কারক। অপরদিকে, বেদবিধি অমান্য করলে যে অধর্ম উৎপন্ন হয়, তার ফলে জীব দুঃখভোগ করে থাকে। যদিও ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনাই এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় দুঃখ সংক্রান্ত আলোচনা এই দর্শনে পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের সূচনা হয়েছে, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' - এই সূত্রের দ্বারা। ব্রহ্মের প্রতিপাদনই বেদান্ত দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। সেখানে বলা হয়েছে, সংসারই বন্ধন। অর্থাৎ বদ্ধজীবই জাগতিক দুঃখ, মৃত্যু, রোগ, শোক ইত্যাদি ভোগ করে থাকে। তবে, শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতবেদান্তে এটিই দেখিয়েছেন যে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবের দুঃখাদি থাকলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগত হল মিথ্যা বা মায়া। অর্থাৎ দুঃখ বলে আদৌ কিছু নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। আবার, রামানুজাচার্য বলেছেন যে, সংসারে আবদ্ধ তথা বদ্ধজীবই সাংসারিক দুঃখভোগ করে থাকে।

শুধু ভারতীয় দর্শন নয়, রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ ইত্যাদি বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রে আমরা এমন বহু চরিত্র ও উপাখ্যান পাই, যেগুলির পরতে পরতে শুধু দার্শনিকভাবই প্রকাশিত হয় না, বরং সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুঃখ-সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ

গৌতম ন্যায়সূত্র-এর প্রথম সূত্রেই তাঁর রচিত গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন যে নিঃশ্রেয়স, তা উল্লেখ করেছেন।[৪] ন্যায়দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স লাভই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন। কাজেই, নিঃশ্রেয়স হল প্রয়োজন এবং প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হল ঐ প্রয়োজনের সাধন। মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ ইত্যাদি নিঃশ্রেয়সবোধক পর্যায় শব্দ। 'মোক্ষ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল মুক্তি। ভারতীয় আধিবিদ্যক তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও মোক্ষের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একটি মৌল সাদৃশ্য আছে। মোক্ষ হল জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি। মোক্ষে নিশ্চিতভাবে ও সম্পূর্ণভাবে চিরকালের জন্য দুঃখের বিনাশ ঘটায় মোক্ষই জীবের কাছে চরম ও পরম পুরুষার্থরূপে বিবেচিত। প্রমেয়বিভাগসূত্রে[৫] মহর্ষি অপবর্গরূপ চরম প্রমেয়ের উল্লেখের অব্যবহিত পূর্বে দুঃখ নামক প্রমেয় পদার্থের নামোল্লেখ করেছেন।

দুঃখ দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত একাদশ পদার্থ। যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ ন্যায়দর্শনের প্রয়োজন, সেই দুঃখের তত্ত্বজ্ঞান লাভও ঐ প্রয়োজনের সহায়ক। বস্তুতঃ যদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান যদ্দুঃখের কারণ, তদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান তদ্দুঃখ নিবৃত্তির কারণ। দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে তদ্বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হবে। দুঃখ বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান এই যে, জীব

[৪] ন্যায়সূত্র ১।১।১।
[৫] ন্যায়সূত্র ১।১।৯।।

দুঃখকেও সুখরূপে বোধ করে। আর, দুঃখ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হল এই যে, প্রকৃত সুখও দুঃখানুষক্ত হওয়ায় সুখও দুঃখ। দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন জন্ম নেই। তাই দুঃখের উক্ত স্বরূপ মুমুক্ষু বুঝলে তবেই তাঁর দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে। আর দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির সাথে অপবর্গ অভিন্ন। মহর্ষি দুঃখের লক্ষণে বলেন, 'ৰাধনালক্ষণং দুঃখম্।'[৬] শরীর থেকে ফল পর্যন্ত সকল প্রকার প্রমেয়ই বাধনালক্ষণ, অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত হওয়ায় দুঃখ। লক্ষণস্থ 'বাধনা' শব্দের অর্থ দুঃখ। দুঃখ সকল জীবেরই মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় সুপরিচিত। তা সকল জীবের প্রতিকূলবেদনীয়। বাধনা, পীড়া, তাপ ইত্যাদি হল পর্যায় শব্দ। এই বাধনা বা দুঃখের সাথে যা অনুষঙ্গবিশিষ্ট, সেই সকলই দুঃখ। দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের মধ্যে শরীরাদি ফল পর্যন্ত অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব ও ফল - এই নয়টি প্রমেয় দুঃখের সাথে নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় সেগুলিও দুঃখ। অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে আছে, তাই দুঃখ। দুঃখের লক্ষণসূত্রে 'লক্ষণ' শব্দের দ্বারা এই অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধই বিবক্ষিত। শরীরে দুঃখের নিমিত্তত্বসম্বন্ধ; ইন্দ্রিয়াদিতে দুঃখের সাধনত্ব সম্বন্ধ; সুখে দুঃখের অবিনাভাব সম্বন্ধ। যা মুখ্য দুঃখ, তার সম্বন্ধপ্রযুক্ত সবই দুঃখ এবং সেগুলি হল গৌণদুঃখ।

দুঃখ হল প্রাণীমাত্রের প্রতিকূলবেদনীয়। প্রমেয়বিভাগসূত্রে সুখের উল্লেখ না করে দুঃখের উদ্দেশের ফলে মনে হতে পারে যে, সুখ নামক পদার্থের প্রমেয়ত্ব মহর্ষির অভিপ্রেত নয়। তবে, সুখের অস্তিত্ব নেই - এটি মহর্ষির অভিমত নয়। বরং সুখের অস্তিত্ব আছে - তা মহর্ষি কর্তৃক স্বীকৃত। কারণ, সুখ সর্বজীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু এই সুখের পূর্বে ও পরে যে দুঃখ আছে - এটিও অবশ্যম্ভাবী সত্য। এজন্য মুমুক্ষু সুখকেও দুঃখ বলে ভাবনা করবেন - এটিই মহর্ষি কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুখও দুঃখানুষঙ্গবিশিষ্ট হওয়ায় সুখও দুঃখ। বস্তুতঃ সুখ দুঃখের প্রকারের অন্তর্গত। অর্থাৎ সুখও এক প্রকার দুঃখ। ন্যায়বার্ত্তিকের

---

[৬] ন্যায়সূত্র ১।১।২১

প্রারম্ভে উদ্দ্যোতকর গৌণ ও মুখ্য ভেদে একবিংশতি প্রকার দুঃখের উল্লেখ করেছেন এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলেছেন। মুখ্যদুঃখ, শরীর, ষড়্‌বিধ অর্থ বা বিষয়, ষড়্‌বিধ বুদ্ধি ও সুখ - এই হল উদ্দ্যোতকর কথিত একবিংশতি প্রকার দুঃখ। 'আমি দুঃখী' - এইরূপে যা সকল জীবের মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, যা প্রতিকূলবেদনীয় বলে কথিত হয়েছে, তাই স্বরূপতঃ দুঃখ অর্থাৎ মুখ্য দুঃখ।শরীরাদি বিংশতিপ্রকার হল গৌণ দুঃখ।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, দুঃখ সর্বজীবের প্রতিকূলবেদনীয়। যা কিছু এই দুঃখের সাথে অনুষঙ্গবিশিষ্ট, সেই সবই দুঃখ । এই কারণে জন্ম-মাত্রই দুঃখ এবং দুঃখসম্বন্ধশূন্য সুখ না থাকায় সুখও দুঃখ। ন্যায়বার্ত্তিককার একবিংশতিপ্রকার দুঃখের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেছেন। তবে, সুখ বা দুঃখের একটিও অপরটির অভাব নয়; তাছাড়া, দুঃখ জ্ঞানস্বরূপও নয় ইত্যাদি আলোচনার পাশাপাশি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে প্রকৃতই পুরুষার্থ বলা যায় কিনা, দুঃখের কারণসমূহ ইত্যাদি বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ অন্যান্য আস্তিক দর্শনে দুঃখের স্বরূপ

এই অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, এবং বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত বিভিন্ন মতবাদ অনুসারে দুঃখের লক্ষণ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে জীবের অনন্ত দুঃখকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক - এই তিন প্রকার দুঃখের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিক দুঃখ শারীর ও মানস ভেদে দু'প্রকার। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মার বৈষম্যবশতঃ যে দুঃখ, তা হল শারীর দুঃখ। এই শারীর দুঃখই হল ব্যাধি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা ইত্যাদির ফলে উৎপন্ন দুঃখই হল মানস দুঃখ, যাকে অধিও বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দুঃখ মাত্রই মনের ধর্ম বা মানস হলেও মানস দুঃখ হল মনোমাত্রজন্য দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ আন্তর উপায়ের দ্বারা সাধ্য। অপরদিকে, আধিভৌতিক ও

আধিদৈবিক দুঃখ অদৃষ্টরূপ আন্তর উপায়সাধ্য হলেও তা মাত্র আন্তর উপায়সাধ্য নয়। মানুষ, পশু,প্রস্তরাদির দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ হল আধিভৌতিক। আর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, পিশাচ, ভূত ইত্যাদি দেবযোনিজন্য দুঃখ হল আধিদৈবিক দুঃখ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণজন্য দুঃখকে কেউ আধিদৈবিক বলেছেন, আবার কেউ আধিভৌতিক বলেছেন। এইপ্রকার দুঃখকে গীতার টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী আধিদৈবিক দুঃখের অন্তর্গত করেছেন।[৭]

সাংখ্যদর্শনে দুঃখকে প্রত্যাত্মবেদনীয় বলা হয়েছে। এই দর্শনে স্বীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে দুঃখের উল্লেখ না থাকলেও তাকে রজঃ গুণের অন্যতম পরিণামরূপে স্বীকার করা হয়েছে। এই কারণে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'রজঃ পরিণামভেদঃ'।[৮] দুঃখকে প্রত্যাত্মবেদনীয় বলা হলেও এমন নয় যে, দুঃখ আত্মায় থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দুঃখ আত্মাতে থাকলেও সাংখ্য মতে তা অন্তঃকরণবৃত্তি। আসলে সাংখ্যস্বীকৃত আত্মা অর্থাৎ পুরুষ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। পুরুষ স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত এবং সকল দুঃখের আত্যন্তিক অভাববিশিষ্ট। অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক অভাবরূপ কৈবল্য পুরুষে স্বতঃসিদ্ধ। অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত পুরুষ অন্তঃকরণবৃত্তি দুঃখাদিকে নিজের বলে মনে করলেও তাতে পুরুষের নিত্যমুক্তাবস্থা ব্যাহত হয় না।

প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান অর্থাৎ বিবেকখ্যাতি না হলে দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি হয়না। প্রকৃতি সৃষ্টি করে পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য। ভোগ ও অপবর্গ - এই দুটি পুরুষের প্রয়োজন। বুদ্ধি স্বগত সুখ-দুঃখভোগকে পুরুষে প্রতিবিম্বিত করে এবং পুরুষে সুখ-দুঃখভোগাভিমান উৎপন্ন করে; আবার বুদ্ধিই প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান অর্থাৎ বিবেকখ্যাতি উৎপাদন ক'রে অপবর্গসাধন ঘটায়। বৈরাগ্য ব্যতীত অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ বৈরাগ্যই অপবর্গের মুখ্য সাধন। দুঃখ প্রাপ্তির মাধ্যমেই পুরুষের বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণা জন্মায়। যে

---

[৭] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কর্তৃক সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ - ২৫৭।

[৮] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, পঞ্চম প্রকাশের পুনঃ মুদ্রণ, ২০১৬, পৃ - ১২।

বস্তু দুঃখদায়ক হয়, সেই বস্তুই জিহাসিত হয় এবং সেই বস্তু থেকে চিত্ত বিমুখ হয়; ফলতঃ সেই বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। কাজেই, সৃষ্ট পদার্থকে দুঃখরূপে মনে করাকেই বৈরাগ্যের উপযোগী বলা হয়েছে। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দুঃখ হেতুক।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাংখ্য মতে, দুঃখ জিহাসার বিষয় হলেও দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। এই কারণেই বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 'যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখম্.....'। সাংখ্যদের এই প্রকার বক্তব্যের মূল কারণ হল, তাঁরা কার্যকারণসংক্রান্ত সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। দুঃখ যখন স্বীয় উপাদানকারণ বুদ্ধিতত্ত্বে সূক্ষ্মরূপে থাকে, তখন তা প্রতিকূল বা বেদনীয় কোনটাই নয়; কিন্তু যখনই সূক্ষ্মরূপ থেকে দুঃখ স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয় তখনই তা প্রতিকূলবেদনীয়ত্বরূপে প্রতীত হয় এবং তখনই তাতে বিচ্ছেদের বিষয়ত্ব ধর্ম আরোপিত হয়। যাইহোক, স্বীয় উপাদানকারণে সূক্ষ্মরূপে থাকে বলেই দুঃখের প্রাগভাব ও বিনাশ বা ধ্বংস স্বীকার করা যুক্তিবিরূদ্ধ। তবে, এখানে উল্লেখ্য যে, দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত না হলেও দুঃখকে তার স্থূলরূপ থেকে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত করানো যায়। তাকেই দুঃখ নিরোধ বা অভিভব বলা হয়।

যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের সমানতন্ত্র হওয়ায় সাংখ্যকথিত দুঃখ সম্পর্কিত সব বক্তব্যই স্বীকৃত হলেও এই দর্শনে পঞ্চবিধ ক্লেশ সম্পর্কে অধিক কথা বলা হয়েছে। এই ক্লেশ হল পাঁচপ্রকার; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ[৯] এই পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই অপর চারটি ক্লেশের মূল। অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ থাকলে ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয় ফলারম্ভী হয়, কিন্তু কারণস্বরূপ ঐ ক্লেশসকল উচ্ছিন্ন হলে তা আর হয় না। কর্মাশয়ের বিপাক বা পরিণাম ত্রিবিধ; যথা - জাতি (মনুষ্যাদি জন্ম), আয়ু (জীবনকাল) ও ভোগ (জীবনকাল) ও ভোগ (সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার)। বিবেকী ব্যক্তি বা যোগীর কাছে সবকিছুই দুঃখ বলে বোধ হয় অর্থাৎ বিষয় মাত্রই দুঃখ। পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ, সংস্কার দুঃখ - এই ত্রিবিধ দুঃখের হাত

[৯] যোগসূত্র ২।৩।।

থেকে ভোগকালেও নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, গুণবৃত্তি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বৃত্তিসকলের পরস্পরের বিরোধী স্বভাব হওয়ায় বিষয় সুখও দুঃখকর, অর্থাৎ কিছুতেই শান্তি নেই।

অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ - এগুলি বেদান্ত দর্শনের অন্যতম প্রধান কয়েকটি মত। প্রত্যেকটি মতই বলেছে যে, জীবের সংসার তথা দুঃখভোগের কারণ হল তার পূর্বকৃত কর্ম। অদ্বৈতবাদে বলা হয়েছে, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জীবের বন্ধন অর্থাৎ দুঃখভোগ থাকলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুঃখ বলে কিছুই নেই; কারণ, এক ও অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। রামানুজের মতে, জগৎ মিথ্যা বা মায়া নয়; সংসার, বন্ধন, বন্ধনজনিত দুঃখভোগ কোন কিছুই মিথ্যা নয়। জীবের কর্মফলানুসারে সুখ-দুঃখের ভোগের জন্যই ঈশ্বর লীলার জন্য এই জগৎ-সংসারের সৃষ্টি করেছেন। নিম্বার্ক তাঁর ভেদাভেদবাদে বলেছেন, ব্রহ্ম বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন নিয়নতৃ, জীবাত্মা ভোক্তৃ এবং জগত ভোগ্য। ভগবান বদ্ধজীবকে তার পূর্বকৃত কর্মের ফল সুখ ও দুঃখের আকারে প্রদান করেন। দেহের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়েই জীবের দুঃখাদির ভোগ হয়ে থাকে। সুতরাং, সংসারই হল বন্ধন। আবার, দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য বলেছেন যে, বন্ধনকে সত্য বললে তবেই জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তবে, এই মতে, জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ব্রহ্মেরই ইচ্ছা। এই দর্শনে নিত্য-সংসারী জীবের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়ে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। মুক্তি এদের জন্য স্থিরীকৃত হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ব্যাবহারিক জীবনে দুঃখের গুরুত্ব

আমাদের ব্যবহারিক জীবন সমস্যা সঙ্কুল। সমস্যার পাঁকে নিমগ্ন ব্যক্তি এক সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাক বা না পাক অপর সমস্যা তার পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। সমস্যার নিষ্কৃতি হলে ব্যক্তির সাময়িক সুখ লাভ হয় বটে; কিন্তু ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তি কোন

জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ দুঃখ মানুষের পিছু ছাড়ে না। কিন্তু দুঃখের গুরুত্ব আমাদের জীবনে অপরিসীম; কারণ আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূলবেদনীয় হওয়ায় দুঃখকে শত্রু বলে মনে হলেও তা আসলে আমাদের বন্ধুরই মতো। বারংবার দুঃখের শিকার হয়ে জীবনের কোন না কোন সময়ে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এই দুঃখ আমরা কেন পাচ্ছি? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ? - এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ যখন জানতে পারে যে, আমাদের পূর্বকৃত কর্মই সুখ-দুঃখের কারণ, তখন সে ভবিষ্যত-দুঃখকে পরিহারের জন্য ধর্মানুসারী কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করে। যেমন, নৈতিক উভয়সংকটের সময় দু'টি সমান বলশালী নৈতিক কর্মের মধ্যে ব্যক্তিকে যখন যেকোন একটি কর্ম সম্পাদন করে অপর কর্মটিকে বর্জন করতে হয়, তখন সেই অসম্পাদিত নৈতিক কর্মটির জন্য ব্যক্তির অনুশোচনাজনিত যে দুঃখ হয়, তা ব্যক্তিকে অনেক বেশী বাস্তববাদী ও সহনশীল করে তোলে। আবার, দুঃখভোগের ভয় ব্যক্তিকে নৈতিক কর্মে প্রবৃত্ত করে; যেমন - ক) পাপের ভয়ে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হয় না। তবে, যদি কেউ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে থাকে, তাহলেও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তার ক্ষয় সম্ভব হয়। আসলে পাপের ফলে অধিক দুঃখভোগের হাত থেকে রক্ষা করে প্রায়শ্চিত্ত, যা অপেক্ষাকৃত লঘু দুঃখ। খ) মনুসংহিতাকার বলেছেন, কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন যেকোন ব্যক্তিকেই যত্নসহকারে বর্জন করা উচিৎ; কারণ, এগুলি পরিণামে দুঃখ বহন করে নিয়ে আসে। গ) যোগদর্শনে কর্মবাদের আলোচনা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে, যার মূলকথা হল - 'যেমন কর্ম, তেমন ফল'। এখানে জন্মান্তরের সমর্থনেও বক্তব্য আছে। ভবিষ্যত-দুঃখের ভয়ে মানুষ যাতে পাপমূলক কর্মে লিপ্ত না হয় - এখানেই এই আলোচনার সার্থকতা। তাছাড়া, ঘ) গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে, কী ধরনের কর্ম করলে কোন্ যোনি প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর স্বরূপ, নরক যন্ত্রণার বিশদ আলোচনা রয়েছে এই পুরাণে, যা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় । এছাড়া, গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করে, তাও এখানে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া, আরো একটি বিষয় এই অধ্যায়ের পরিসরভুক্ত হয়েছে, যা হল - আমাদের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা অন্যের সুখ-দুঃখকে উপলব্ধি

করতে সহায়তা করে। এই বিষয়টি যে শুধুমাত্র বর্তমান মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানেরই আলোচ্য তা নয়, বরং ভারতীয় দর্শনেও এর উল্লেখ আছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ দুঃখই মুক্তির সোপান

মুক্তি বা মোক্ষ ভারতীয় দর্শনের পরম প্রতিপাদ্য বিষয়। বহুবিধ বিষয় ভারতীয় দর্শনে আলোচিত হলেও সেই সব আলোচনাই মোক্ষে গিয়ে থেমেছে। অর্থাৎ মোক্ষই ভারতীয় দার্শনিক আলোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এক এক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মুক্তি সম্পর্কে এক এক মত পোষণ করেছেন। তবে, যে যেভাবেই মুক্তিকে ব্যাখ্যা করুন না কেন সকলেই স্বীকার করেছেন যে, জীবের সংসার বন্ধনজনিত দুঃখ আছে বলেই তা থেকে জীব মুক্তি পেতে চায়। অর্থাৎ বন্ধনজনিত দুঃখের প্রসঙ্গেই মুক্তির আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা পায়। মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই তা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে; কারণ, বন্ধন মাত্রই বিবেকী পুরুষের কাছে তা দুঃখের। এই কারণে দুঃখকে মুক্তির সোপান বলা যায়। 'সোপান' শব্দটির অর্থ সিঁড়ি বা ধাপ। সিঁড়ি আমাদের উপরে উঠতে সাহায্য করে। দুঃখকে যখন মুক্তির সোপান হিসাবে গণ্য করা হয়, তখন তার অর্থ এই যে, দুঃখ নামক সোপানের মাধ্যমেই মানুষের বন্ধনদশা থেকে মুক্তির পথে উত্তরণ ঘটে।

দুঃখই আমাদের বৈরাগ্যের জন্ম দেয় এবং মুক্তির পথ উন্মোচন করে। এই প্রসঙ্গেই 'দুঃখই মুক্তির সোপান' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে; কারণ, সংসারবন্ধনরূপ দুঃখ আছে বলেই মুক্তির এত কদর। দুঃখরূপী এই সোপান আমাদের সার্বিক উত্তরণ ঘটায়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনেও এই কারণেই আমরা দেখি যে, দুঃখের আলোচনার পরেই অপবর্গের

আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়দর্শনেও আত্মাদি দ্বাদশ প্রকার উদ্দেশের ক্ষেত্রে মহর্ষি গৌতম প্রচ্ছন্নভাবে উক্ত মতই সমর্থন করেছেন।[১০]

মুমুক্ষুর সামনে ভোগ্য বিষয় উপস্থিত হলেও তাতে বিতৃষ্ণারূপ উপেক্ষাবুদ্ধি জন্মায়, যাকে বৈরাগ্য বলে। যে ব্যক্তির বৈরাগ্য জন্মেছে তিনিই বিরক্ত। এরূপ বিরক্ত ব্যক্তিই সাধনার ফলে কালে অপবর্গ তথা মুক্তি লাভ করে থাকেন। সুতরাং, দুঃখরূপ সিঁড়িতে না দাঁড়ালে মুক্তিরূপ সিঁড়িতে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটতে পারেনা।

এই সোপান শুধু উত্তরণই ঘটায়, এক্ষেত্রে নিম্নগমনের কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজেই, যে জীব মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না, মুক্তি এক চিরস্থায়ী অবস্থা। সাংখ্যকারিকাতেও এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, মুক্তপুরুষের পুনরায় জন্ম স্বীকার করা যায় না; এমন কি মুক্ত পুরুষের অন্য কল্পেও বন্ধন স্বীকার করা হয় না; কারণ তাহলে আর মুক্ত ও বদ্ধ জীবের মধ্যে কোন বিভেদ থাকে না।[১১] তাছাড়া মুক্তজীবের যে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, এই বিষয়ে উপনিষদেও প্রমাণ আছে। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছেন, ''তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ'';[১২] ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছেন, ''ন চ পুনরাবর্ততে''।[১৩]

উপসংহার

মোক্ষকে মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে দেখানো ভারতীয় দর্শনের এক বিশেষ শৈলী। ন্যায়দর্শনে মোক্ষকেই অপবর্গ বলা হয়েছে। শুধু ন্যায়দর্শন নয়, অন্যান্য ভারতীয় দর্শন যেমন, সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত - এইসব আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়, এমনকি বৌদ্ধ, জৈন - এই নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়েও

---

[১০] ন্যায়সূত্র ১।১।৯।।
[১১]সাংখ্যকারিকা ৬।১৭, ১৮, ১৯।
[১২] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।২।১৫।
[১৩] ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।১৫।১।

মোক্ষকেই জীবের পরম প্রয়োজন বলা হয়েছে এবং এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই উক্ত সকল দর্শনের যাবতীয় আলোচনা প্রসার লাভ করেছে।

মানুষ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক - এই ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা মানুষের জীবন জর্জরিত। মানুষের জীবন দুঃখময় বলেই মানুষকে দুঃখত্রয়ের অভিঘাত থেকে মুক্ত করা ভারতীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। মুক্তি বলতে এই দুঃখত্রয়ের অভিঘাত থেকে মুক্তির কথাই এখানে বলা হয়েছে। ন্যায়দর্শনে জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বা অপবর্গ বলা হয়েছে। মুক্তিতে জন্মপ্রবাহের অত্যন্ত উচ্ছেদ হওয়ায় তাতে সব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে থাকে। দুঃখ আছে বলেই তা থেকে মুক্তি জীব মাত্রেরই কাম্য। সব দর্শনেই দুঃখকে হেয় বা পরিত্যাজ্য বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সব দর্শন সম্প্রদায়ই মুক্তি বিষয়ক আলোচনার আগে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ, দুঃখের অস্তিত্ব ছাড়া মুক্তির প্রসঙ্গ অর্থহীন।

দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায় যে, দুঃখের অস্তিত্বকে আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের পার্থিব আনন্দের সঙ্গে কোন না কোন দুঃখানুভূতি সম্পৃক্ত থাকবেই। আসলে দুঃখ না থাকলে সুখেরও কোন কদর থাকত না। সত্য হল এই যে, জাগতিক সকল সুখের সঙ্গে দুঃখানুভূতি জড়িত রয়েছে। পার্থিব সুখ মাত্রই দুঃখসম্পৃক্ত। রাতের আকাশে বিদ্যুতের চমকের মতোই জগতে সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। দুঃখের স্থায়িত্ব সুখের তুলনায় অনেক বেশী। জাগতিক সুখের তুলনায় স্বর্গসুখের স্থায়িত্ব অধিক হলেও স্বর্গসুখও দুঃখবিমিশ্রিত; কারণ, স্বর্গসুখভোগকাল অতিক্রান্ত হলে পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসার ভয়ে স্বর্গবাসীগণ কখনো কখনো দুঃখিত হয়ে পড়েন। সুতরাং, আসল কথা হল, কোনো সুখই চিরস্থায়ী হয় না।

বস্তুতঃ অনাত্ম বস্তুকে আত্মা বলে যে ভ্রম বদ্ধ জীবের হয়, তার ফলেই তাকে যত দুঃখ ভোগ করতে হয়। মূঢ়, অবিবেকী ব্যক্তিগণ তীব্র আসক্তির বশে জাগতিক বিষয়ভোগে মত্ত থাকে, এবং তারা নিজ নিজ কর্মফলের দ্বারা চালিত হয়ে কখনো পশু, তির্যক প্রভৃতি

জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, আবার কখনো স্বর্গাদি লোকের সুখভোগও করে। কাজেই, এইভাবে তারা বারবার জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা সংসারদুঃখ ভোগ করতে থাকে। দুঃখ হল জীবের পূর্বজন্ম অথবা ইহ জন্মের অধর্মরূপ কর্মের ফল। আমরাই আমাদের কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে দুঃখের কারণ হই। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ বলেছেন, 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'। অর্থাৎ সুখ হোক বা দুঃখ, কেউই তা আমাদের দান করেন না; বরং তা হল আমাদেরই স্বকৃত পূর্বকর্মের ফল। এই বিষয়ে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করে, তার কৃত বা সম্পাদিত সেই কর্মের ফল তাকে ইহজন্মে বা পরজন্মে ভোগ করতেই হবে। ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে, কৃতের নাশ যেমন হয় না, তেমনি অকৃতের ভোগও হয় না। যেমন কর্ম, তেমন ফল - এটিই নৈতিক জগতের কার্য-কারণ নিয়ম। এই নিয়মকেই বেদে ঋত বলা হয়েছে। ঋতই সমগ্র জগতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। এটিকেই আবার ধর্মও বলা হয়েছে; কারণ, যা ধারণ করে, তাই ধর্ম। যাঁরা ঈশ্বরবাদী তাঁরাও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন যে, ঈশ্বর তো দয়াময়, মঙ্গলময়, আনন্দময়। তাহলে তাঁর সৃষ্টিতে এত দুঃখ, এত অমঙ্গল কেন ? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে তাঁরাও ঐ একই উত্তর প্রদান করে থাকেন। ঈশ্বরবাদীগণ আরো বলেন যে, মা যেমন সন্তানকে শাসন বা ভ সনা করেন সন্তানের মঙ্গলের জন্য, তেমনই দুঃখ হল ঈশ্বরের দান। আগুনে পুড়ে যেমন সোনা খাঁটি হয়, তেমনি দুঃখের আগুনে দগ্ধ করিয়ে ঈশ্বর মানুষকে ভগবৎমুখী করান। সুতরাং, দুঃখ হল জীবের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। অধর্মের ফলস্বরূপ যে দুঃখভোগ আমাদের হয়, তা দুঃখের মোড়কে বিধাতার পুরস্কার। আমরা দেখেছি যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের সখা হলেও তাঁরা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে নিদারণ কষ্টভোগ করেছেন, রামায়ণে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে এবং রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করেছেন। পুরাণে দেখেছি যে, ধ্রুব বিমাতার কঠোর বাক্যে যে দুঃখ পেয়েছিলেন, তা অতিক্রম করার জন্য সে শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং ভগবদ্ কৃপায়

সে তাঁর ইচ্ছানুসারী যথাযথ স্থান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা নিঃসন্দেহে ত্রিজগতে সর্বোৎকৃষ্ট। ধ্রুবের উপাখ্যান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্যক্তির অদৃষ্টে যে পরিমাণ দুঃখ ভোগের থাকে, তা থেকে পালাবার পথ নেই। সুতরাং, দুঃখের জন্য অপর ব্যক্তিকে দোষারোপ করা বদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলেও জ্ঞানিজন তা মনে করেন না। আবার, প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু কর্তৃক আনিত বহু ধরনের ক্লেশ জয় করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর অচলা হরিভক্তির মাধ্যমে।

বস্তুতঃ দুঃখ সবসময়ই কাম্য, যখন তা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অন্নগ্রহণ করলে মানুষের যে সুখলাভ হয়, তার জন্যও রন্ধনরূপ দুঃখ মানুষকে পোহাতে হয়। আসলে উদ্দেশ্যের ভিন্নতার জন্যই সুখ দুঃখে, আবার দুঃখ সুখে পরিণত হয়। দুঃখ যে সর্বথা হেয় নয়, তা বোঝাতে কবিও বলেছেন, 'এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো'; অর্থাৎ দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণার অভিঘাত এসে উপস্থিত হলে আমরা সাধারণ বদ্ধ জীব সব সময় ঈশ্বরকেই দায়ী করে থাকি এবং আমাদের মতো ভোগবাদী মানুষ তাঁকে নিষ্ঠুর বলি। কাজেই এটা আমদের ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবি এই দুঃখের হানাহানিকে ভালো বলেছেন। সুতরাং, এটাই স্পষ্ট যে, আপাতভাবে দুঃখ যতই হেয় হোক না কেন তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

জগতে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি কর্মপথ রয়েছে। একটি হল শ্রেয়মার্গ এবং অপরটি হল প্রেয়মার্গ। যিনি প্রেয়মার্গকে বরণ করেন, তিনি ক্ষণস্থায়ী সুখকে প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হন এবং ফলতঃ তার হীনতা প্রাপ্তি হয়; কারণ, সুখমাত্রই আপাত মধুর ও চিত্তাকর্ষক। জাগতিক সুখ মাত্রই তা দুঃখযন্ত্রণার মাধ্যমে লব্ধ। অপরদিকে, শ্রেয়মার্গ ব্যক্তিকে সত্য বা মঙ্গলের দিশা দেখায়। এই কারণে জ্ঞানগিণ এবং অধ্যাত্মমার্গী মনীষিগণ, যাঁরা এই পথের পথিক, তাঁরা ইন্দ্রিয়ের জগতের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের তুলনায় শাস্বত আনন্দকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থাপন করেছেন। আসলে এই কর্মপথ দু'টির

একটি হল জ্ঞানের পথ এবং অপরটি হল অজ্ঞানের, যাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। অজ্ঞান অর্থাৎ প্রেয়মার্গ আমাদের সুখের দিকে অর্থাৎ চির অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। সাধারণ বদ্ধ মানুষ ভোগে লিপ্ত হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় এবং এইভাবে জীবন অতিবাহিত করাকেই সুখকর বলে মনে করে। কিন্তু জ্ঞানের অর্থাৎ শ্রেয়মার্গে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই বিচরণ করতে পারেন, যাঁরা জাগতিক সুখভোগের উন্মত্ততা দেখে ভীত এবং বিতৃষ্ণ হন। জাগতিক প্রাচুর্যে আমরা যতই আত্মহারা হই না কেন, আমাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক মুমুক্ষুত্ব থাকে, যা কখনো কখনো আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে। কিন্তু মানুষের মন যখন দুঃখ-যন্ত্রণার মুহূর্তে অন্তর্মুখী হয়, তখন আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার জাগরণ হয়। সুতরাং, অদৃষ্টের বিড়ম্বনাই শিক্ষকের কাজ করে থাকে। সাংসারিক ঘটনাপ্রবাহ অধ্যাত্ম চিন্তন থেকে আমাদের দূরে রাখলেও দুঃখ-দুর্ভাগ্যই আমাদের মনকে ভগবৎমুখী করে তোলে, আমাদের চোখ খুলে দেয়। পুরাণ, উপনিষদ্ সর্বত্র বলা হয়েছে যে, আত্মজ্ঞানের জন্য মুমুক্ষু পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হবেন। সংসাররূপ দুঃখ-সাগরে যে ক্লেশই আসুক না কেন, ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিভাব বজায় রেখে আত্মনিবেদন করলে ঐ ক্লেশ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। ন্যায়সূত্রকার গৌতমও ব্যক্ত করেছেন যে, জগৎকর্তা পরমেশ্বরই জীবের ধর্মাধর্মরূপ সব কর্মের কারয়িতা ও ফলদাতা। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কোনো ব্যক্তির কোনো কর্মই সফল হয় না; সুতরাং, মুক্তিও হতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজী গ্রন্থসমূহ ঃ

Bhattacharya, Gopinath, *Essays In Analytical Philosophy*, Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1989.

Bhattacharya, Sailajakumar, *Vaidika Ethics: An Analytical Approach*, Calcutta, Department of Philosophy, Jadavpur University, 2000.

Billimoria, Purushottama. Joseph Prabhu, et al., editors., *Indian Ethics*, New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Bose, Roma. *Vedanta Parijata-Saurabha of Nimbarka and Vedanta-Kaustubha of Srinivasa,(Vol : III)* Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 19433.

Chatterjee, Suniti Kumar., et al., editors., *The cultural Heritage Of India, (Vol : I)*, Kolkata, The Ramakrishna Mission Institute Of Culture, 2006.

Dasgupta, Surama, *Development of Moral Philosophy in India*, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Second edition,1994.

De, S.K., et al., editors. *The Cultural Heritage Of India, (Vol :II)*, Kolkata, The Ramakrishna Mission Institute Of Culture, 2006.

Ghate, V.S., *Vedānta : A Study of The Brahma-Sūtras with the Bhāsyas of Śaṁkara, Rāmānuja, Nimbārka, Madhva and Vallabha*, V.G. Paranjpe (ed.), Poona,, Bhandarkar Oriental Research Instititute, 1926.

Hiriyanna. M., *Outlines of Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 2009.

Maitra, Sushil Kumar, *The Ethics Of The Hindus*, Calcutta, University of Calcutta, Third edition, 1963.

Mohanty, J.N., *Theory and Practice*, Calcutta, Allied Publishers Limited in collaboration with Jadavpur University, First Publication, 1994.

Nag, Anita, *Six Systems of Vedānta Philosophy*, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, First Publication, 1986.

O'Flaherty, wendy Doniger editor, *Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions*, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, Reprint of first edition, 1999.

Olivelle, Patrick editor, *Dharma Studies in its Semantic, Cultural and Religious History*, Delhi, Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, First Edition, 2009.

Rao, P. Nagaraja, *Introduction to Vedānta*, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, First Publication, 1958.

Sharma, B.N.K., *Philosophy of Sri Madhavācārya*, Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, First Publication, 1962.

Sharma, I.C., *Ethical Philosophies of India*, Stanley M. Daugert editor, London, George Allen &Unwin LTD., 1965.

Sharma, Ratna Dutta, *Philosophical Discourse : It's Nature and Types in the Nyāya Philosophy*, Kolkata, Allied Publishers Pvt. Ltd. In collaboration with Jadavpu University, First edition, 2002.

Srinivasachari, P.N. *The Philosophy of Bhedābheda*, Madras, The Adyar Library, Second Edition, 1950.

বাংলা গ্রন্থসমূহ ঃ

অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ-দীপিকা সহিত* , শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী অনূদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

অন্নংভট্ট, *সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ,* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় সংস্করণের পুনঃ সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

আরণ্য, হরিহরানন্দ, *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫।

উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী,* গৌরীনাথ শাস্ত্রী অনূদিত ও বিবৃত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯০।

উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি,* শ্রীমোহন ভট্টাচার্য তর্কবেদান্ততীর্থ অনূদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৫।

উদ্দ্যোতকর, *গৌতমীয় ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক,* অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, নিউ দিল্লী, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর্ ফিলসফিকাল্ রিসার্চ, ১৯৯৭।

কবিরাজ, গোপীনাথ, *ভারতীয় সাধনার ধারা,* কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক - ৩২, ১৯৬২ ।

কবিরাজ, বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণঃ,* বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, পুস্তক, ৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী সম্পাদিত, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, সপ্তম সংস্করণ১৯৬২-এর ৪০তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী সম্পাদিত, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চম সংস্করণ১৯৬৪ -এর ২২তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫।

গম্ভীরানন্দ, স্বামী সম্পাদিত, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী তৃতীয় ভাগ,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৬৫ -এর ২২তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭।

গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৭।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (প্রথম খণ্ড),* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৩।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড),* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (তৃতীয় খণ্ড),* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (চতুর্থ খণ্ড),* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮।

গৌতম, *ন্যায়দর্শন (পঞ্চম খণ্ড),* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৯।

চক্রবর্তী, অরিন্দম, *মননের মধু,* গাঙচিল, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪।

চ্যাটার্জী, অমিতা সম্পাদিত, *ভারতীয় ধর্মনীতি,* কলকাতা, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।

জৈমিনি, *মীমাংসা-দর্শনম্ প্রথম খণ্ড,* ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪১৩-এর পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬।

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়পরিচয়,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬।

ন্যায়াচার্য, গঙ্গাধর কর, *মহাজীবনের অন্তরালে,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৯।

ন্যায়াচার্য, গঙ্গাধর কর, *নীল আকাশের নীচে,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২১।

প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্য (প্রথমভাগ),* শ্রী শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ ও দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম অনূদিত ও সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্য (দ্বিতীয়ভাগ),* দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম অনূদিত ও সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ (১৪০৭ বঙ্গাব্দ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ, *ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ*, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

বাৎস্যায়ন, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শনভাষ্য*, অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, ইন্ডিয়ান্ কাউন্সিল্ ফর্ ফিলসফিকাল্ রিসার্চ্ , নিউ দিল্লী, ১৯৯৭।

বিদ্যারণ্য, স্বামী, *গীতাধর্ম*, কলিকাতা, মুক্তা, ১৯৮৩।

বিবেকানন্দ, স্বামী, *আমার ভারত অমর ভারত*, স্বামী সুপর্ণানন্দ সম্পাদিত, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৫।

বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী অনুদিত, *বেদান্তদর্শনম্*, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ এর পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪।

বেদব্যাস, মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, তুলি-কলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮।

বেদব্যাস, মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, তুলি-কলম, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৩।

বেদব্যাস, *গরুড় পুরাণ*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩।

বেদব্যাস, *বেদান্ত-দর্শনম্* (শারীরকভাষ্য ও শ্রীভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ সংযুক্ত), পণ্ডিত শ্রীনলিনীনাথ রায় ভাষ্যানুবাদক, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বাংলা ১৩৪১।

বেদব্যাস, *মহাভারত*, রাজশেখর বসু অনূদিত, কলকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৭।

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, *ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী সংগ্রহ (ন্যায়-সিদ্ধান্ত-মুক্তবলীটীকাসহ)*, কলিকাতা, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, ঝর্ণা, *অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য্য, সুখময়, *পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশের দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৬।

মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

মনু, *মনুসংহিতা,* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত, কলকাতা, সদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১২।

লৌগাক্ষিভাস্কর, *অর্থসংগ্রহঃ,* বিশ্বরূপ সাহা কর্তৃক সরল আলোচনা, কলকাতা, সদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

লৌগাক্ষিভাস্কর, *অর্থসংগ্রহ,* স্বামী ভর্গানন্দ অনূদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

শর্মা, রত্না দত্ত, *ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক্ এজেন্সী, ২০১১।

শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, *ভারতীয় দর্শনকোষ (২য় খণ্ড),* কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৪।

শ্রীকৃষ্ণযজ্ব, *মীমাংসা পরিভাষা,* স্বামী বাসুদেবানন্দ অনূদিত, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশের দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০১০।

শ্রীম, *শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম খণ্ড,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭-এর ৪২তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৬।

শ্রীম, *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭-এর ৪১তম পুনর্মুদ্রণ ২০১৫।

সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার,* লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ, ২০১১।

সরস্বতী, মধুসূদন, *গূঢ়ার্থদীপিকা,* নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত ও ভূতনাথ সপ্ততীর্থ অনূদিত, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬।

সান্যাল, ইন্দ্রাণী ও রত্না দত্ত শর্মা সম্পাদিত, *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।

সারদানন্দ, স্বামী, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ প্রথম ভাগ,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৬০-এর ৩৩তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬।

সারদানন্দ, স্বামী, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগ*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, একাদশ সংস্করণ ১৯৬৩-এর ৪০তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৬।